রুদ্ধদ্বার

দিবাকর দাস

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

রুদ্ধদ্বার

দিবাকর দাস

© : লেখক

প্রথমপ্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪
প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ
প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূমিকা

'দ্যা নেস্ট অফ স্পাইডার' নামে একটা বইয়ের মাধ্যমে দিবাকর দাস'কে চেনা। প্রথম বইতে গতানুগতিক ধারায় না হেঁটে পুরনো গল্পকে নতুন করে বলার যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তা আমাকে বিস্মিত করেছিল, ভালো লেগেছিল তার সেই প্রচেষ্টা। তারপর একে একে প্রতি বইমেলায় নতুন নতুন লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বই গুলো পড়ে দেখার সুযোগ হয়নি।

এবার দিবাকর দাস যখন ঘোষণা দিলেন 'রুদ্ধদ্বার'-এর, আমি অতিমাত্রায় কৌতুহলী হলাম। কারণ এই বইতে তিনি নতুন এক চরিত্রকে সবার সামনে তুলে ধরবেন। বাংলা সাহিত্যে এমনিতে গোয়েন্দা চরিত্রের প্রধান দুই পুরুষ হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়ের *ফেলুদা*, শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ব্যোমকেশ বক্সী*। তবে বাংলাদেশের সাহিত্যে তেমন কোনো গোয়েন্দা চরিত্র চোখে পড়ে না যার বুদ্ধির প্রখরতায় খুব জটিল জটিল সমস্যার সমাধান মেলে। দিবাকর দাস'র 'রুদ্ধদ্বার'-এ আসছে ঈশান রায়। অন্যান্য গোয়েন্দাদের মতো ঠিক গোয়েন্দাবৃত্তিতে তার মন ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রেই সে চলে আসে গোয়েন্দাগিরিতে। সাধারণ এক চাকরি-প্রত্যাশী যুবক থেকে সে পরিণত হয় একজন ঝানু গোয়েন্দায়।

দিবাকর দাসের লেখা অনেক সহজ, ঘটনার বিস্তার ঘটানো এবং সেটাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনার কাজটায় তিনি অভিজ্ঞ।

ঈশান রায়ের যাত্রা শুরু হলো 'রুদ্ধদ্বার'-এর মাধ্যমে। এই উপন্যাসটি তার লেখালেখির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং পাঠক নতুন এই চরিত্রের সাথে পরিচিত হয়ে রোমাঞ্চিত হবেন।

'রুদ্ধদ্বার'-এর সাফল্য কামনা করি।

শরীফুল হাসান
সিদ্ধেশরী, ঢাকা
৫ই মার্চ, ২০২১

কিছু কথা

কিছু স্বপ্ন আমরা লালন করি, আর কিছু স্বপ্ন আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। খুবই ভাগ্যবান লোকের ক্ষেত্রে এই দুই ক্ষেত্র মিলে যায়। আমার অষ্টম বই 'রুদ্ধদ্বার' - এ তাই হয়েছে। এই জায়গায় আমি ভাগ্যবান। মনের মধ্যে একটা গোয়েন্দা চরিত্রকে সৃষ্টি করার একটা তীব্র ইচ্ছা যেন ঠিক সত্ত্বায় মিশে ছিল। আর ভিতর থেকে সেই চরিত্রের তাড়াও যেন আমি শুনতে পেতাম। যেন সে আমার ভিতরে বাস করে আর থেকে থেকে বলে, "কী, আর কতো দিন গর্ভে রাখবে আমাকে? এখনও কি আমার বেরোনোর সময় হয়নি?"

হ্যাঁ, বেরোনোর সময় হয়েছে। সময় হয়ে আমার সৃষ্ট চরিত্রকে পাঠকের সামনে আনার। এই চরিত্রের সাথে আমার অনেক দিন বাস করার ইচ্ছে আছে, আর আশা করি পাঠকও ঈশান রায়কে তাদের সাথী বানাবেন। জন্মের প্রথম শুভক্ষন অমলিন না হোক।

আমার এই চরিত্র আরেকটা কারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ২০২০ সাল আমাদের জন্য অবশ্যই বিভীষিকা, কিন্তু ঈশ্বরের সবচেয়ে বড়ো উপহার আমার মেয়েকে আমি এই বছরই পেয়েছি আর এই বছরই আমার কলম এই চরিত্রের জন্ম দিলো।

ঈশান রায় গতানুগতিকের চেয়ে আলাদা। আলাদা রহস্য অথবা তদন্তের জন্য নয়। এগুলোতে প্রথার বাইরে যাওয়ার তেমন কোনো সুযোগ নেই। তবে সে চিন্তায় আলাদা, আর এই অনন্য মননই তাকে পাঠক মনে জায়গা দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাঠকদের স্বাগতম আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা চরিত্রের জগতে।

-দিবাকর দাস

(এক)

ঘরে থাকা আলো এই কাজে যথেষ্ট নয়। ঝুঁকে পড়েও তেমন লাভ হচ্ছে না। চোখ কুঁচকে হচ্ছে। অনেক কষ্টে অবশেষে খুঁজে পেলো ঈশান।

সিয়েরা লিওন। আফ্রিকার উপকূলের একটা দেশ। আয়তনে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক। একদিকে সমুদ্র, বাকি তিনদিক স্থল ঘেরা।

না, এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাতে ঢাকার গোপীবাগের এক শেওলা ধরা পাঁচিলের বাড়ির দোতলায় বসে থাকা ঈশানের এই দেশ সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাতে পারে। মাঝেমধ্যে ঘটনার তীব্রতার চেয়ে গুরুত্ব বেশি হয়ে যায়। ঈশান কোন অনলাইন পত্রিকা চালায় না, সিয়েরা লিওন থেকে কোন তরুন কিংবা তরুণী প্রেমের টানে বাংলাদেশে চলে আসেনি যে তা নিয়ে ফেসবুকে চটকদার পোস্ট দিতে হবে।

গুরুত্ব অন্য জায়গায়। এই দেশ আমাদের ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। একেকজন অবশ্য একেক কথা বলছে। কেউ বলছে এমন কিছুই হয়নি। এটা একটা ভুয়া খবর। আবার কেউ বলছে না, ওরা বাংলাকে ২য় মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়েছে। সে যাই হোক, আমরা ক্রেডিট নিতে অনেক ভালোবাসি। আমাদের বাংলাদেশের মর্দনে হতাশ হয়ে কে একজন বহু আগে দেশ ছেড়ে গেছে, তার মেয়ে অথবা ছেলে অথবা নাতি-নাতনি যদি অলিম্পিকে সোনা জেতে, তাহলে বাঙ্গালী সোনা জিতলো, আবার কেউ যদি ব্রিটেনে পার্লামেন্ট মেম্বার হয় তবে সেও আমাদের ক্রেডিট। নাড়ির বাঁধনকে টেনে ইলাস্টিকের মতো লম্বা বোধকরি আর কোন জাতি এভাবে করে না।

আমাদের দেশে চাকুরি প্রার্থীদের সাম্প্রতিক বিষয়ে জ্ঞান রাখা অতি আবশ্যক। সে সব ব্যাপারে---কে বোমা মারলো, কে মরলো, কে কোথায় কাঠি দিলো, কে কি আবিষ্কার করলো, ইতিহাসের কড়চা, সাহিত্যের বুৎপত্তি, এলিজাবেথ-ডিকেন্স-শেক্সপিয়ার-রবীন্দ্র-নজরুল-লক্ষণ সেন-তুঘলক-কুরি-নিউটন-লারা-ম্যারাডোনা-টেন্ডুলকার, সব মিলেমিশে একাকার। সরকারি সিভিল এবং অন্যান্য সার্ভিসে ঢুকতে হলে এসব পড়তেই হবে। প্রশ্নকর্তা আবার সোজাসুজি কোন প্রশ্ন করেন না। একটু ঘুরিয়ে করেন। ড্রাফট কপির দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হাসেন। তাতে থাকে পৈশাচিক আনন্দ।

ঘুরিয়ে সিয়েরা লিওন নিয়ে কি কি প্রশ্ন করা যায় তার এক তালিকা করছে ঈশান।

সিয়েরা লিওনের রাজধানীর নাম কী?

জাতিসংঘের কততম রাষ্ট্র?

আয়তন কত?

অর্থকরী ফসল কী?

স্বাধীনতা কবে পেয়েছে?

এমন আরও কিছু প্রশ্ন সাজিয়ে নিলো সে। তারপর একবার গভীরভাবে ভাবলো। না, আর চিন্তার কিছু নেই। প্রশ্নকর্তা এর চেয়ে গভীরে যাবেন বলে মনে হয় না। তবু মন মানে না। মনে হয় কিছু বাদ পড়ে গেলো। তারপরও মনকে মিছে সান্ত্বনা দেওয়া--- না, এর মধ্যেই কমন পড়ে যাবে।

হঠাৎ করে তার ঘরের আলো কাঁপতে শুরু করলো। ঈশান বুঝতে পারলো, বাবা বাড়ি এসেছেন। সদর দরজার সাথে এই লাইটের সম্পর্ক এখনো খুঁজে বের করা যায়নি। তবে সম্পর্ক তো একটা অবশ্যই আছে। ওই দরজা খুললেই কিছুক্ষণ এই আলো কাঁপে। হয়তো দশ সেকেন্ড। মাঝে মাঝে আরও বেশি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে। রাজধানীর নাম ' ফ্রি টাউন'। দাসদের মুক্তি দেওয়া উপলক্ষে শহরের নাম এমন হয়েছে। নামটা মনে মনে কয়েকবার আউড়ে নিলো সে। তারপরও ভরসা নেই। মাঝেমধ্যে ভালোভাবে জানা জিনিসও মাথায় থাকে না। প্রশ্ন সামনে আসলে দেখা যায় মগজ ফাঁকা হয়ে গেছে।

ঘরের দরজায় আওয়াজ হলো। মাথা তুলল না ঈশান, "বলো বাবা।"

"কি চিন্তা করলি?"

"কি নিয়ে চিন্তা বাবা?"

"সেটা তুই জানিস। আমার অফিসে আমি তোর কথা অনেক আগেই বলে রেখেছি। তুই তো ওখানে কাজ করতে পারিস। আয় না কাল একবার।"

একটা বড় শ্বাস ফেললো ঈশান, "বাবা আগেই বলেছি, তোমার ওই অফিসে আমি কাজ করতে পারবো না। ওইসব আমার জন্য না। তুমি আমার ওপর আরেকটু ভরসা রাখো। আমাকে আর কিছু সময় দাও। স্বীকার করছি, তিনবারে হয়নি। তবে আমি এবার ভালোভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। এবার হয়ে যাবে। ক্যাডার না পেলেও নন-ক্যাডার পেয়ে যাবো। একবার কোন একটা সরকারি চাকরি পেলে সারাজীবনের জন্য নিশ্চিন্ত। তোমার ব্যাপার আমি বুঝি না বাবা। সবার বাবাই চায় ছেলের একটা সরকারি চাকরি, একটা ক্যারিয়ার। আর তুমি আমাকে বারবার টেনে নামাতে চাও তোমার ওই অফিসে।"

"ওই চাকরিও তো সরকারি।"

"তাহলে তুমি বলছো ওরা আমাকে একটা পার্মানেন্ট পোস্ট দেবে?"

"না, তা দিতে পারবে না। সেখানে তো নিয়ম আছে। পরীক্ষা আছে। তোকে এমনিতে চাকরি আমি পাইয়ে দেবো।"

"সে হবে না বাবা। ফাই-ফরমাশ খাটতে পারবো না আমি। তারচেয়ে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো। তোমার ওই অফিসে কখনো পরীক্ষার নোটিশ বেরোলে আমাকে জানিয়ো। চেষ্টা করে দেখবো।"

অবিনাশ রায় হতাশ আর ক্লান্ত চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। ঠিকই তো বলছে ছেলে। তিনি একটা অফিসে সারা জীবন নিচু পোস্টে চাকরি করে কাটিয়েছেন। তার ছেলের অধিকার আছে জীবনটা নিজের মতো করে সাজানোর। একজনের স্বপ্ন আরেকজন কেন পূরণ করবে? তবু মন মানে না। মাঝেমধ্যে ইচ্ছে ডানা মেলতে চায়। ভুলে যায় পাখি, শরীরের সাথে সাথে বুড়ো হয়েছে পাখাও। এখন আর উড়তে চাওয়া উচিত নয়, শুধু ডানা ঝাপটানোই সার।

দরজা থেকে ছায়াটা সরে গেলো। দাঁতে দাঁত চেপে বসলো ঈশানের। এবার আর বিফল হলে চলবে না। তিনবারের একবারও প্রিলি পাস করতে পারেনি সে। বাবাকে দোষ দিয়ে লাভ কি।

স্কুলে বেশ ভালো ছাত্র ছিল সে। ঢাকার এক নামী স্কুলে সবসময় ওপরের দিকে নাম থাকতো। নটরডেমে সিট পেয়েছিলো। তারপরই ইন্দ্রপতন। ওই বয়সে ছেলেদের বখে যাওয়ার অনেক কারণ এদেশে আছে। সেগুলোর কিছুই ঘটেনি। বড় ঘটনা বলতে তখন মা মারা গেছেন। আর মায়ের মৃত্যুতে বাবা কয়দিন ছিলেন উদাসীন। ওর দিকে তেমন নজর দিতে পারেননি।

থাক সেসব। ছাত্র খারাপ হয়ে গেলেও একেবারে গোল্লায় যায়নি। মেডিক্যাল-বুয়েটে না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা হয়েছিলো তার। তেমন ভালো সাবজেক্ট না। তবে সাবজেক্ট ভালো খারাপের প্রশ্ন অবান্তর। একেবারে শুরু থেকেই বিসিএস পড়া শুরু করেছিলো সে। তবে বিধি বাম। এখনো প্রিলি পাস করা হলো না।

বাবা এসে গণ্ডগোল করে দিয়েছে। এখন আর সিয়েরা লিওনের শ্রাদ্ধে মন বসবে না। তারচেয়ে নিচে গিয়ে একটা সিগারেট খেয়ে আসা যাক। সম্মান এখনো টিকে আছে। কতদিন থাকবে কে জানে। এখনো বাপ মা জীবিত থাকতে এই দেশের ছেলেরা ঘরে সিগারেট খায় না। তবে দিন বদলের ডাক শোনা যায় মাঝেমধ্যে। এখন নাকি অনেক পরিবারে বাপ,মা, ছেলে, বোন বসে একসাথে মদ আর তাস চলে। কালচারের আমদানি চলছে। কাক এখন শুধু ময়ূর পুচ্ছ লাগিয়েই ক্ষান্ত নয়, সে ময়লা খাওয়াও বাদ দিয়েছে। কাক আর ময়ূর দু'দলের মানুষই দেশে

আছেন। কেউ ধর্মীয় আর সামাজিক নীতি একশ ভাগ আঁকড়ে ধরেছেন, কেউ একেবারেই ছেড়েছেন। দুইয়ের মধ্যে পাল্লার ভার কার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছে সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

"রহমান ভাই, সিগারেট দাও।"

"চা খাইবা না?"

"না সিগারেট দাও।"

সিগারেট ধরিয়ে বিরস বদনে টানতে লাগলো ঈশান। এখন চা হলে খুব ভালো হতো। তবে সে উপায় নেই। রহমান ভাই লোক ভালো হলেও তার বিশেষ একটা হিসেব আছে। তার দোকানে কোন বাকি চলে না। পকেটে কেবল একটা সিগারেট খাবার টাকা আছে। আজ টিউশনির টাকা দেবার কথা। বাবার কাছে মাসে একবারের বেশি হাত পাততে ইচ্ছে করে না। নিজেকে আত্মসমর্পণ করা পরাজিত যোদ্ধা বলে মনে হয়। ওনার অফিসের ধারেকাছেও যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। ওসব দৌড়ঝাঁপের চাকরি পোষাবে না। যেভাবেই হোক একটা সরকারি চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে। বেসরকারি ভালো চাকরি তার কপালে নেই। ওসব করার জন্য অন্য অনেক ভালো সাবজেক্টের লোকজন আছে।

"তা তোমার কিছু হইলো?" রহমান ভাই বরাবরের মতো জিজ্ঞেস করলেন।

ঈশান এই পাড়ার স্বীকৃত বেকার। এসব প্রশ্ন অনেক শুনতে হয়। অনেকবার কোন ঘটনা ঘটলে নাকি সয়ে যায়। তবু কেন জানি ওর সয়ে যায় না। প্রশ্নটা শোনামাত্র গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

"না এখনো হয়নি। দোয়া কোরো ভাই।"

"তা তো করুমই। একটু চেষ্টা করো।"

টাকা দিয়ে বেরিয়ে আসে ঈশান। পড়াতে যেতে এখনো ঘণ্টা দুয়েক সময় বাকি আছে। সময়টা নষ্ট করা যাবে না। আরও কিছু সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা যাক।

ঘরের দরজায় বড় তালাটা ঝুলছে। বাবার আড্ডা দিতে যাবার সময় হয়েছে। তিনি বেরিয়েছেন। আড্ডার কথা ভেবেই মনটা আরও খারাপ হয়ে গেলো তার। বন্ধুরা এখনো রোজ বিকেলে বসে। তার যাওয়া হয় না। ওরা বেশিরভাগই বড়লোকের ছেলে। তাদের বাতাসে গা ভাসালে চলবে না। আগে জীবনে স্থিতি চাই। তারপর অমন আড্ডা, ঘোরাঘুরি অনেক করা যাবে।

সাধারণ জ্ঞানের পাতা খুলল সে। সাথে সাথে বাতি নিভে গেলো। লোডশেডিং। এই ঘরে দিনের আলো তেমন একটা ঢোকে না। যা গরম পড়েছে তাতে ফ্যান ছাড়া থাকা নরকে থাকার শামিল। হতাশায় চেয়ারে পুরোপুরি গা এলিয়ে দিলো সে। পরক্ষনেই দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বোলাল বইয়ের পাতায়। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারলো না। সিয়েরা লিওন অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইলো।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর পড়াতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে। সেই বাসায় জেনারেটর আছে। কারেন্ট চলে গেলেও কোন সমস্যা হয় না।

নিচে নেমে এলো। শেষ বিকেলে গলিটা লোকে লোকারণ্য। সবসময় এমনই থাকে। এই ভিড়ের সাথে গা মিশিয়ে হাঁটতে লাগলো। আর পাঁচজন লোকের সাথে তার পার্থক্য কী? সবাই জীবনের টানে ছুটে চলেছে। তারও একই অবস্থা। আমাদের আলাদা হবার কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম। তবু শেষে আমরা সবাই চারজনের ওপরই নির্ভর করি। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সবারই এক গতি। চার আর নিজে এই পাঁচজনে মিলে শেষ হয় জীবনচক্র। যেখান থেকে সব শুরু সেখানে গিয়েই সব শেষ।

দর্শন মাঝে মাঝেই ঈশানের চিন্তায় উঠে আসে। যদিও তত্ত্বগুলোর প্রায় সবই পরীক্ষা পাসের জন্য শেখা তবু দীর্ঘ রগড়ে এখনো দাগ একটু রয়ে গেছে। সাধারণের মাঝে বিশেষ হবার চেষ্টা যে আসলে একটা ভ্রান্ত প্রচেষ্টা তাই হচ্ছে সব তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

কলিংবেলে আঙ্গুল ছোঁয়াল সে। সেই সাথে ভাবনায় ছেদ পড়লো।

"স্যার, আজকে তাড়াতাড়ি আসছেন।"

"হ্যাঁ। আজ রাতে একটু কাজ আছে। তাই তাড়াতাড়ি এসেছি। তুমি কি কোন কাজ করছিলে?"

"না স্যার।"

"তাহলে টেবিলে বসো।"

পরের প্রশ্নটা পড়াশোনার ব্যাপারে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও আর্থিক ব্যাপারে বেশ প্রয়োজনীয়, "তোমার মা কি ঘরে আছেন?"

"জি স্যার।"

বুক থেকে পাথর নেমে গেলো ঈশানের। আজ টাকাটা খুবই দরকার। এমনিতে না দিলে চাইতে হবে।

আজ পড়ানোতে উল্টো রথ চলছে। প্রতিদিন ছাত্রীর মনোযোগ থাকে না। আজ স্যারের নেই। কোনমতে নমঃ নমঃ করে পূজা চলছে। ঈশানের পুরো নজর ভেতরের দরজার দিকে। ছাত্রীর মা কখন দরজা খুলে এই ঘরে আসবেন।

আজ টাকাটা না পেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। প্রতিদিন পড়ায় না সে। কাল বাদে আবার পরশু আসবে। এই দুদিন তাহলে সিগারেট খাওয়া মাথায় উঠবে। অস্থির লাগবে শরীর। শরীর অস্থির লাগলে পড়ায় মন বসবে না। তাছাড়া এমপিথ্রি সিরিজের নতুন একটা বই এসেছে। খুবই নাকি ভালো। কমন পড়ার অনেক সম্ভাবনা। ওটাও কিনতে হবে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেলো। এতক্ষণ পড়ায় না সে। তবু আজ সময়ের বাইরে গিয়ে আরেকটা অংক করতে দিলো।

"স্যার, শেষ।"

"হু, দেখি।" প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সময় নিয়ে দেখলো সে অংকটা। না, কোন ভুল নেই যেটা শুধরে নেবার জন্য আরও কিছুক্ষণ সময় বাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে।

"তুমি পরের অংকগুলো করে রাখবে। আমি পরশু এসে দেখবো।"

"আচ্ছা স্যার।"

ঈশান উঠে দাঁড়ালো। তার নজর ভেতরের পর্দার দিকে। না কোন কাঁপন নেই।

দরজার দিকে এগোলো সে। ধীর পায়ে। নবে হাত দিতেই পেছন থেকে ছাত্রীর ডাক, "স্যার, শুনুন।"

ঈশান ফিরে তাকালো।

"আম্মু আপনাকে বসতে বলেছে।"

বুকের চাপটা আবার হালকা হলো ঈশানের। চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো সে।

একটু পরেই ভদ্রমহিলা ভেতরে এলেন। বাসার ভেতরেও চোখ ধাঁধানো সাজ তার। সবই সিরিয়ালের ফল।

"রুমকি ভেতরে যাও। টিভি দেখো গিয়ে।"

বাধ্য মেয়ের মতো ভেতরে চলে গেলো রুমকি।

ছাত্রীর মা কোন ভূমিকা নিলেন না, "আসলে আপনার সাথে কয়েকদিন ধরেই কথা বলবো ভাবছি। ওর বাবা একটা কথা বলেছে আপনাকে বলতে।"

"জি বলুন।"

"আপনি এতদিন রুমকিকে অনেক ভালো পড়িয়েছেন। তবে এবার তো রুমকি বিজ্ঞানে ভর্তি হলো। তাই ওর বাবা বলছিলো বুয়েটের কারো কাছে পড়লে আরও ভালো হবে। আপনি কি বলেন?"

বুকের ভেতরে লাগা ধাক্কা একটু আগেই লেগেছিলো। তা কোনমতে চেপে রাখলো ঈশান, "জি, তাহলে তো ভালোই হয়।"

"ওর বাবা বুয়েটের একটা ছেলে ঠিক করেছে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ওরাই ভালো পড়াতে পারবে।"

"জি, তা তো অবশ্যই।"

(চার)

ডাক্তার সাহেব রোগী দেখছিলেন। এই ঘরের সিসিটিভিতে রোগীদের অপেক্ষা করার স্থান দেখা যায়। রোগী পরীক্ষা করতে করতে সেই ক্যামেরার মনিটরের দিকে নজর গেলো তার। এখনো বেশ কিছু রোগী আছে সেখানে। আজ বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হবে মনে হচ্ছে।

চলতি রোগীকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেই আবার তার নজর চলে গেছে মনিটরে। একজন লোক প্রবেশ করেছেন এই মাত্র। লোকটাকে দেখেই তার চোখ সরু হয়ে উঠলো। এই লোক এখন এখানে এসেছে কেন?

রোগী চলে যেতেই বেল বাজালেন তিনি। বাইরে থেকে তার সহকারী মেয়েটা ভেতরে এলো।

"শোনো, আর কয়জন রোগী আছে?"

"নয় জন।"

"আচ্ছা। তাদেরকে বলো, ডাক্তার সাহেব একটু পর রোগী দেখবেন। তারা যাতে একটু অপেক্ষা করেন।"

মেয়েটা মনে মনে একটু বিরক্ত হলো। আজকে তারও একটা জরুরী কাজ আছে। একটু আগে বেরোতে পারলে ভালো হতো। তবে রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে আগে বের হওয়াটা হবে না, "জি স্যার।"

"আর এইমাত্র আমাদের রিসেপশনে একজন লোক ঢুকেছেন। গায়ে সবুজ ব্লেজার আর কালো টাই। খেয়াল করেছো?"

"জি স্যার।"

"ওনাকে এখনই এই ঘরে পাঠিয়ে দাও।"

"জি স্যার।" মেয়েটা ঘর ত্যাগ করলো। একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন সদ্য যৌবন পেরোনো ভদ্রলোক।

এই লোক যেনতেন কেউ নন। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা বিশাল। যেখানে তার সিরিয়াল পেতে রোগীদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়, সেখানে তাকে এই লোকের পরিবার মোটা টাকা দিয়ে পারিবারিক ডাক্তারের পদে বসিয়ে রেখেছে। এই লোককে তোয়াজ করতেই হবে।

"জি বসুন।" লোকটা ঢুকতেই বলে উঠলেন ডাক্তার।

লোকটা বসলো। ভঙ্গিতে তীব্র কতৃত্ব ফুটে উঠেছে।

"বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি? আমাকে একটা কল করলেই তো বাসায় চলে যেতাম।"

"না, বাসায় ডেকে নেয়ার মতো গুরুতর ব্যাপার নয়। বাবার ব্যাপারে আপনার সাথে একটু কথা বলতে এলাম। কয়েকদিন ধরে বাবার শারীরিক আর মানসিক অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে না।"

"দেখুন, এই বয়সে মানুষের মনের অবস্থা একটু স্থবির হয়ে যায়। এসব স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে ওনার শারীরিক সমস্যা তেমন কিছু নেই। শুধু একটা সমস্যার কথা গতদিন বলেছিলেন উনি।"

"কি সমস্যা?"

"সমস্যাটা ওনার একটু পুরানো। ঘুমের সমস্যা। আমি ওষুধ দিয়েছিলাম। তাও নাকি ঠিকমতো ঘুম আসে না। তারপর আমি আরেকজন ডাক্তার নিয়ে আপনাদের বাসায় যাই। তিনি খুব বড় ডাক্তার। তিনি ঘুমের ওষুধ বদলে দিয়েছিলেন। তারপর আর উনার কোন খবর পাইনি। এখন কেমন আছেন?"

"ভালো তো বলতে পারছি না। কেমন যেন নিস্প্রাণ হয়ে পড়েছেন। কারো সাথে কোন কথা বলেন না, ঘর থেকে বেরোন না।"

"চিন্তা করবেন না। বৃদ্ধ বয়সে নিভৃতচারী হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। আমি কাল-পরশু গিয়ে একবার ওনাকে দেখে আসবো।"

"আচ্ছা, আপনার চেম্বারের সময় অনেকখানি নষ্ট করলাম। এবার তাহলে আমি চলি।"

"আরে না, কি বলছেন। যে-কোনো জরুরী কাজে যে-কোনো সময়ে কল করবেন।"

"ধন্যবাদ ডক্টর।"

(পাঁচ)

বিপদ নাকি অনেক সঙ্গী সাথী নিয়ে আসে---এই প্রবাদ আমাদের সমাজে বেশ চালু একটা কথা। আমাদের সমাজ ব্যাবস্থা অবশ্যই এই প্রবাদ সমর্থন করে। আকস্মিক কোন ঘূর্ণি বাতাস যদি জীবন এলোমেলো করে দেয় তাহলে তাকে আপাত অর্থে বিপদ বলা যায়। হ্যাঁ, সে বিপদ আমাদের দেশে কখনোই একা আসে না। ধরা যাক সবচেয়ে প্রচলিত বিপদ মানে স্বাস্থ্য বিপদের কথা। আপনি এক্সিডেন্ট করলেন অথবা একটা বিশ্রীরকমের তীব্র কোন রোগে আক্রান্ত হলেন। একটা বিপদ এলো। তারপর হাসপাতালে গেলেন। ধরে নিলাম আপনি কোন হোমরাচোমরা নন। তাহলে সেখানে আরেক বিপদ। দালালের খপ্পর। ডাক্তারদের নাগাল না পাওয়া। এমন অনেক বিপদের মুখোমুখি হয়ে আপনি যখন সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসেন তাহলেও কিন্তু বিপদের শেষ নেই। অনেকে আপনাকে দেখতে আসবেন, তাদের মধ্যে অনেকে ঘাঁটি গেঁড়ে বসবেন আপনার বাসায়। আপনার সেই টানাটানির সময়ে তাদের মেহমানদারিতে আপনাকে বাড়তি খরচ করতে হবে কিছু অমূল্য টাকা। তারপর অফিসে অসুস্থ ছুটি পাশ করানোর জন্য ছুটাছুটি। কিছু বিশেষ অফিস হলে সেখানেও টাকা খরচ।

তার মানে এদেশে মধ্যবিত্তদের জন্য বিপদ একলা আসে না। ঈশান যদিও মধ্যবিত্ত পর্যায়ে পড়ে তবু এবার তার অন্য কোন বিপদ হলো না। হাসপাতালে তার বাবার চিকিৎসা ভালোই চলতে লাগলো। সম্ভাবনার চেয়েও আগে অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ড আর ইন্সুরেন্স দুটোর টাকাই পাওয়া গেলো।

হাসপাতালেই আপাতত বাস করছে সে। ঘরে তালা ঝুলিয়ে এসেছে। এমন না যে হাসপাতালে তার খুব একটা কাজ আছে। তবু এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করে না তার। আইসিইউ ব্লকের বাইরে চেয়ারে অথবা দেয়ালের ওপর বসে থাকে বেশিরভাগ সময়। তার বাবার এখনো পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি। সে আশা করে আচমকা তার বাবার জ্ঞান ফিরবে। আবার ঘরে ফিরে যাবেন তিনি। তার ঘরে গিয়ে নিঃসঙ্গতা কাটাতে জিজ্ঞেস করবেন নানা কথা। আপাত বিরক্তিকর সেই কথাগুলো শোনার জন্য ওর কান যেন উদগ্রীব হয়ে উঠছে। কানেরও যে তৃষ্ণা অনুভূত হয় তা সে ভালো করেই বুঝতে পারছে।

রোগীর সঙ্গীর খাওয়াদাওয়ার ব্যাবস্থা হাসপাতালে নেই। কাছে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে। তবে সেগুলোর খাবার বেশ দামী। নিয়মিত তিনবেলা খাওয়া

এখানে পোষায় না। একটু দূরে একটা হোটেল খুঁজে বের করেছে ঈশান। সেখানে দুপুরে খায়। মাঝে মাঝে রাতে খেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আবার কোন কোন রাত কাটায় হাসপাতালে। গত দুই সপ্তাহে তার জীবন এভাবেই চলছে।

টাকা যাচ্ছে জলের মতো। দুই সপ্তাহে লাখ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেছে। তাও নাকি সাধারণ রেটের থেকে হাসপাতাল অনেক কম চার্জ করছে। বাবার অফিসের সাথে নাকি এই হাসপাতালের কি চুক্তি আছে।

দুপুরে খেতে বেরিয়েছে সে। দশ মিনিট হাঁটতেই পৌঁছে গেলো প্রতিদিনের ঠিকানায়। এখানে সার্ভিস খুবই দ্রুত। দুমিনিটের মধ্যে তার সামনে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত আর আলু ভর্তা চলে এলো। প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতেই বেজে উঠলো রিংটোন। মোবাইল বের করে দেখতে পেলো সিসিইউ-এর এক নার্সের নাম্বার।

"হ্যালো।" নিশ্চয়ই কোন ওষুধ অথবা দরকারি কিছু লাগবে।

"আপনি কোথায়? তাড়াতাড়ি হাসপাতালে আসুন।"

নার্সের কণ্ঠ ঈশানকে যেন একেবারে স্তব্ধ করে দিলো। না, কোন ওষুধ অথবা অন্য কোন ব্যাপার থাকলে নার্স এতো ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকতো না। মাখা ভাতের ওপর পানি ঢেলে হাত ধুলো সে। তারপর বেরিয়ে এলো টাকা দিয়ে।

সিসিইউ-এর সামনে নার্স একা নন। বাবাকে যিনি দেখেন সেই ডাক্তারও আছেন। তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ঈশান, "তাড়াতাড়ি বলুন কি আনতে হবে। একটা কাগজে লিখে দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। আগেরবার গুলিয়ে ফেলেছিলাম নামটা।"

ডাক্তারের মুখ থমথমে। জীবনে অনেকবার দিয়েছেন তিনি এই দুসংবাদ মানুষকে, "আপনার বাবা আর নেই।"

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শায়িত বাবার পাশের টেবিলে রাখা যন্ত্রের মনিটরের দিকে তাকালো সে। না, গত কয়েকদিনের পরিচিত স্পন্দনগুলো আর নজরে পড়ছে না। বুকের স্পন্দনের সাথে সাথে যন্ত্রের স্পন্দনও থেমে গেছে।

কোন কথা, চিৎকার অথবা আর্তনাদ বেরোলো না ঈশানের মুখ থেকে। আস্তে করে পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। চোখ শুন্যে স্থির, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর। শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, নির্ঘুম রাত্রির পীড়ন সব আজ থেকে শেষ। যা হবার হয়ে গেছে।

দুঃখের চেয়ে এইযে *যা হবার হয়ে গেছে* এই চিন্তাই তাকে একটু বেশি স্বস্তি দিচ্ছে না? মৃত্যু হবেই, তাতে শোক হবে। এসব বদলানোর উপায় নেই। সেই নিশ্চিত শোকের উপলক্ষ্যের চেয়ে এই ক'দিনের অনিশ্চিত সময় আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছিল তাকে। এখন নিশ্চিন্তে শোক করা যাবে। মানুষে ভেতরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সবসময়ই স্বার্থপর আর ভীষণ নিষ্ঠুর।